ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় লিপিসমূহের পরিচয়

Palaeography শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। palaios ও graphein। প্রথমটির অর্থ প্রাচীন, দ্বিতীয়টির অর্থ লিখনক্রিয়া। তাই Palaeography শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে পুরালিপি বা প্রত্নলিপি। বস্তুতঃ এই শব্দ বোঝায় প্রাচীন ঐতিহাসিক হস্তলিখিত লিপি সংক্রান্ত চর্চাকে। এই চর্চার মধ্যে বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যেমন, প্রাচীন লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার ও পঠন-পাঠন, লিপির অক্ষরাবলির স্বরূপ বিচারপূর্বক লিপি বিবর্তনের ইতিহাস পুনর্গঠন, অক্ষরশৈলীর বিশ্লেষণপূর্বক ঐতিহাসিক লেখ্যসমূহের কাল নির্ণয়, লিখনশৈলীর সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ নির্ণয়, অভিলেখ ও গ্রন্থসমূহের পুথি প্রস্তুত করার উপায়, উপাদান ইত্যাদির আলোচনা। অভিলেখ ও পুথিবিদ্যা চর্চার একটি প্রধান সাধন এই বিদ্যা। লিপির পাঠোদ্ধার না করা গেলে লেখ্যগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার সম্ভব নয়। আবার বিভিন্ন লিপির অক্ষরের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করে তাদের স্থান ও কালের বিচার, তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় ইত্যাদির মত কাজও পুরালিপিতাত্ত্বিককে করতে হয়। পুরালিপিবিদদের সৌজন্যে যেমন আমরা প্রাচীন লিপিতে লেখা অভিলেখগুলি অধ্যয়নের সুযোগ পাই, তেমনি সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ইত্যাদি ভাষায় লেখা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পুথির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনের মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যের মণিমুক্তাগুলির সঙ্গেও পরিচয় ঘটে।

ভারতবর্ষে লিপিতত্ত্বচর্চার ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথমেই যে লিপির কথা আসে সেটি হল আদি ব্রাহ্মী লিপি যা মৌর্য ব্রাহ্মী বা অশোক ব্রাহ্মী নামেই বেশি জনপ্রিয়।

মৌর্যকালীন ব্রাহ্মী বা আদি ব্রাহ্মী লিপি-

যদিও সিন্ধু সভ্যতার চিত্রলিখন সম্বলিত সিলমোহরগুলি ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন অভিলেখ বলে স্বীকৃত, এগুলির লিপি বা ভাষা কোনোটাই জানা না থাকায় এদের নিশ্চিত পাঠোদ্ধার কোনো পণ্ডিত এখনো করে উঠতে পারেননি। যে সব অভিলেখের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে প্রচলিত আদি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা মৌর্য সম্রাট অশোকের

Scanned with CamScanner

অভিলেখমালা- এই রকমই এতকাল জানা ছিল। কিন্তু ইদানীং শ্রীলঙ্কার অনুরাধপুর ও তিস্সমহারামে আবিষ্কৃত কিছু প্রত্নবস্তুর উপর ব্রাহ্মী লিপির নমুনা দেখা গেছে যেগুলির কাল কমপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক। সেগুলিই আদি ব্রাহ্মী লিপির এতাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মানা হচ্ছে। খরোষ্ঠী লিপি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইন্দো-গ্রীক, ইন্দো-শক, ইন্দো-পার্সী ও কুষাণ রাজাদের শাসন কালে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের পরে কুষাণ সাম্রাজ্যের শাসনকাল শেষ হলে ভারতবর্ষে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার বিশেষ চোখে পড়ে না।

আদি বা প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত লিপি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে। দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব ও মধ্য এশিয়ারও লিপিসমূহের জননী এই লিপি। প্রথম দিকে লিপিতাত্ত্বিকেরা ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তন বর্ণনায় সমকালীন শাসক রাজবংশের নামানুসারে সেই সেই সময়ের লিপিগুলির নামকরণ করেছিলেন – মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ব্রাহ্মী এই ভাবে। কিন্তু উত্তরকালীন পণ্ডিতবর্গ তা মানেন না, কারণ কেবল ঐ রাজবংশগুলির প্রচারিত লেখ্যসমূহেই ঐ লিপিগুলি পাওয়া যাচ্ছে এমন নয়, অন্যান্য রাজবংশের ও সাধারণ ব্যক্তিদের লেখানো অভিলেখেও তার প্রবল উপস্থিতি রয়েছে। তাই এখন প্রাচীন বা আদি (আর্লি) ব্রাহ্মী, মধ্য (মিড্ল) ব্রাহ্মী ও উত্তরকালীন (লেট্) ব্রাহ্মী - এইভাবেই এই বিবর্তিত রূপগুলিকে নির্দেশ করা হয়।

ভারতের মূল ভূখণ্ডে (প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের) প্রাপ্ত অশোক অভিলেখে প্রাচীন ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি এবং তিনপ্রকারের উপভাষা (পণ্ডিতরা এদের প্রাচ্যা, পশ্চিমা ও উত্তরপশ্চিমা প্রাকৃতভাষা বলে উল্লেখ করেছেন) প্রযুক্ত হয়েছে। উত্তরকালীন ব্রাহ্মীর পরবর্তী যুগে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এই লিপির আঞ্চলিক রূপ দেখা যাচ্ছে। আদি ব্রাহ্মীর উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ এর ভারতীয় উৎপত্তির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, কেউ বিদেশী উদ্ভবের কথা বলেছেন। প্রথম মতটি যাঁদের তাঁরা ভারতীয় চিত্রলিপি, সিন্ধু লিপি, অশোকের সময় ভারতীয় বৈয়াকরণদের প্রতিভাবলে উদ্ভাবিত লিপি, বৌদ্ধ তন্ত্রমণ্ডল ইত্যাদি নানা উদ্ভবের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। বৈদেশিক উৎপত্তির সমর্থকদের মধ্যে যাঁরা সেমিটিক বীজের কথা বলেন তাঁরা গ্রীক, খরোষ্ঠী, দক্ষিণ সেমিটিক, ফিনিশীয় (উত্তর সেমিটিক), আরামীয়- এই সব বিভিন্ন লিপিকে আদি ব্রাহ্মীর জননী বলেছেন। এর মধ্যে Bühler এর উত্তর সেমিটিক লিপি সম্পর্কিত তত্ত্বটিই অদ্যাবধি উৎকৃষ্টতর প্রমাণের অভাবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মানা হয়।

Scanned with CamScanner

মৌর্য যুগে সম্রাট অশোকের অভিলেখগুলিতে যে লিপির প্রয়োগ হয়েছে তাকে আধুনিক পণ্ডিতবর্গ ব্যবহারিক সুবিধার জন্য ব্রাহ্মী নাম দিলেও সেই যুগে তাকে ব্রাহ্মী নামেই অভিহিত করা হত কিনা তা নিশ্চিত নয়। ব্রাহ্মী এই নামটি বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে উল্লিখিত লিপি-নামাবলির আদিতেই বর্তমান। চৈনিক বৌদ্ধ বিশ্বকোষ *ফা ইয়ুয়ান চুলিন্* -এ যে লিপির নামটি বৌদ্ধ গ্রন্থ *ললিতবিস্তরে* উল্লিখিত ব্রাহ্মী লিপির প্রতিনিধিত্ব করছে সেটি ঐ বিশ্বকোষ অনুযায়ী বাঁ থেকে ডান দিকে লেখা হয়, যেমন আমরা প্রাচীন ব্রাহ্মী ও তার বিবর্তিত রূপগুলিতে পাই। সেইকারণেই টেরিয়েন ডি লাকুপেরি (ও তাঁর আগে টি. শুৎজে) একে ব্রাহ্মী নাম দেন।

এই লিপির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-

- এটি বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়; একটি পঙ্ক্তির শেষে নীচের পঙ্ক্তির বাম দিকে ফিরে গিয়ে আবার বাম থেকে ডাইনে লেখাটি এগোয়।

- অক্ষরগুলি সাধারণতঃ জ্যামিতিক ঋজুতা সম্পন্ন। শীর্ষমাত্রা নেই। বিভিন্ন অঞ্চলের অভিলেখগুলিতে অক্ষরের বেশ কিছু শৈলীগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

- এটি অক্ষরাত্মক বা সিলেবিক লিপি। এই ধরনের লিপির বর্ণমালার অন্তর্গত বর্ণগুলি একটি অন্তর্নিহিতস্বর (এক্ষেত্রে "অ") সহ উচ্চারিত হয় (তুল, একাচ্)। ঐ স্বর("অ")-কে আলাদা কোনো চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ করতে হয় না। তবে ব্রাহ্মী ও তার বিবর্তিত রূপগুলিকে বিশুদ্ধ অক্ষরাত্মক বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ একমাত্র "অ" ছাড়া বাকি স্বরগুলির সংযোগ আলাদা চিহ্ন অর্থাৎ ডায়াক্রিটিক এর সাহায্যে দেখাতে হয়। বিশুদ্ধ সিলেবারি-র (সিলেব্‌ল্‌ধর্মী চিহ্নের সাহায্যে গঠিত বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা, যেমন জাপানী ভাষা) ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিটি স্বর সহ গঠিত সিলেব্‌ল্ এর জন্য আলাদা আলাদা চিহ্ন থাকে।

- প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালায় ছ'টি মূল স্বরবর্ণ আছে – অ, আ, ই, উ, এ, ও। প্রাকৃত ভাষায় ঈ ও ঊ এর বিরল প্রয়োগের কারণে এবং অভিলেখগুলিতে তাদের প্রয়োগের অবকাশ না ঘটায় তাদের পাওয়া যায়নি; ব্যঞ্জনবর্ণে অবশ্য ঈ- ও ঊ-সংযোগ আছে। প্রাকৃত লেখার জন্য প্রয়োজন না থাকায় ঋ, ৠ, ঌ,ৡ, ঐ এবং সম্ভবতঃ ঔ মূল স্বররূপে বা সংযোগে (সংযোগে ঐ অবশ্য আদি ব্রাহ্মীতে আছে) কোথাওই পাওয়া যায় না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে এদের সূচক বর্ণই ছিল না। কারণ ঐ সময় সংস্কৃত পুথি লেখার জন্য অবশ্যই 'ঐ' বর্ণগুলির ব্যবহার ছিল। অভিলেখে ঐ সময় প্রাকৃত ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার না থাকায় ঐ সব বর্ণের রূপগুলি আমাদের সামনে আসেনি। প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালায় ও বর্ণটিও

Scanned with CamScanner

একই কারণে পাই না। ঙ (যা সংযোগ ছাড়া বিরল) প্রাকৃতে অনুস্বারে পরিণত হয়। মূর্ধন্য ল এর ব্যবহার পাই। এই প্রকার ল পরবর্তী কালের সংস্কৃত অভিলেখেও রয়েছে। হলন্ত ব্যঞ্জন নেই। কারণ প্রাকৃতে শব্দের অন্ত্য হল্‌টি লুপ্ত হয় আর অন্ত্য ম অনুস্বার হয়। তাছাড়া শব্দের মধ্যগত স্বরবিহীন ব্যঞ্জন পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

- ব্যঞ্জনসংযোগগুলি সরল। প্রায়ই বর্ণগুলির পূর্ণ শরীর উচ্চারণ অনুযায়ী উপরে নীচে লেখা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চারণের বিপরীত অবস্থানও দেখা যায়, যেমন – র ফলা প্রায় সর্বদা নীচের বদলে উপরে, ব্য কে য্‌ব, স্ট কে ট্‌স – এইরকম ভাবে লেখা হয়। অনুস্বারকেও বর্ণের পদমূলে দেখা যায় কখনো।

- কোনো কোনো বর্ণের দর্পণ প্রতিবিম্বের মত দুমুখো রূপও আছে, যেমন – ধ।

- স্বরসংযোগের ক্ষেত্রে সবসময় ব্যঞ্জনবর্ণের হুবহু একই জায়গায় স্বরচিহ্ন নাও দেওয়া হতে পারে। অক্ষর অনুযায়ী তা পালটায়। আবার ও-কারের ক্ষেত্রে ডান ও বাম দিকের অনুভূমিক রেখাদুটির কোন্‌টি একটু উপরে আর কোন্‌টি নীচে থাকবে তারও কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তারা পাশাপাশি হয়ে একটি রেখা হিসেবেও থাকতে পারে ও দুপাশে একই স্তরেও থাকতে পারে।

মধ্য ব্রাহ্মী (Middle Brāhmī)

শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের অভিলেখে আদি ব্রাহ্মী বর্ণমালার লক্ষণীয় বিবর্তন সমূহ হল-

- খ্রিঃ পূঃ ২য় থেকে প্রথম শতকে কালি-কলম মাধ্যমে লেখার প্রভাবে (influence of ink-pen writing) লম্বরেখা যুক্ত অক্ষরগুলির শীর্ষে প্রায়শই ক্ষুদ্র ত্রিভুজসদৃশ বিন্দুর আবির্ভাব ঘটেছে। পরবর্তীকালে এই বিন্দুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে নানা আকার উদ্ভূত হয়েছে। এই ভাবেই উত্তর কালে ভারতীয় বর্ণমালায় শিরোরেখার আবির্ভাব হয়েছে। অ, আ, ক প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্পষ্টতই তা দৃশ্যমান। এই শিরোরেখা থেকে দেবনাগরী একটানা শিরোমাত্রা, ওড়িয়া লিপির বক্র ছত্রসদৃশ মাত্রা ও তেলুগুর চেক মার্ক সদৃশ মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে।

- প, স ইত্যাদি অক্ষরের ক্ষেত্রে কোনো কোনো অভিলেখে আদি ব্রাহ্মীর বক্ররেখা চৌকোনা আকার নিয়েছে।

- আদি ব্রাহ্মীর ক্রশ সদৃশ ক এর লম্ব রেখা দীর্ঘতর হয়েছে ও অনুভূমিক রেখাটি সরল থেকে বক্র হয়েছে।

Scanned with CamScanner

- গ এর মাথার সূক্ষ্মকোণ বক্ররেখা হয়েছে।
- ধ এর দিক্ পরিবর্তন হয়েছে।
- ম, অন্তঃস্থ্ ব এর মত অক্ষরের বক্ররেখা কৌণিক হয়েছে।
- র এর বক্ররেখাযুক্ত রূপ সরল রেখা হয়ে গেছে।
- আদি স্বর রূপে 'ঐ' আবির্ভূত হয়েছে (হাতিগুম্ফা অভিলেখে দৃশ্যমান)।

খ্রিস্টিয় ১ম থেকে ৩য় শতক পর্যন্ত অক্ষরে ক্রমশ ভৌগোলিক কারণবশত পার্থক্য আসছে এবং আঞ্চলিক রূপভেদ দেখা দিচ্ছে। যদিও এখনো তাদের একই লিপির বিবর্তনজাত বলে চেনা যাচ্ছে, তবু তারা যে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক লিপিতে বিবর্তিত হবে তাও স্পষ্ট।

- এই সময় আদি ব্রাহ্মীর অন্তঃস্থ্ ব এর লম্ব রেখাটি অদৃশ্য। ভ বর্ণ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ।
- মূর্ধণ্য ণ টানা হাতে (Cursive) লেখার কারণে তার সরলরৈখিক বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক ভাবে একটু বক্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যার থেকে পরে গুপ্তযুগে তা ভিন্ন একটি রূপ পাচ্ছে।
- দুটি সমান্তরাল লম্বরেখাযুক্ত অক্ষরগুলির ক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্মীতে যে দৈর্ঘ্যের বৈষম্য ছিল, সেই রেখাগুলিকে সমান করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।
- ত বর্ণটি আদি ব্রাহ্মী থেকে অন্যরকম ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। শিরোরেখা সহ গোল ধরনের ত দেখা যায়, যার উপরের লম্ব রেখাটি অদৃশ্য।
- স্বরবর্ণ সংযোগের ক্ষেত্রেও আদি ব্রাহ্মীর কৌণিক সংযোগের জায়গায় বক্ররেখা যুক্ত লীলায়িত ধরনের আকার, ইকার, ঈকার দেখা যায়।
- লম্বরেখাযুক্ত অক্ষরের লম্বরেখাটি অনেক সময় বেশি লম্বা হয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে বাঁদিকে উঠে গেছে ইত্যাদি।

উত্তর ব্রাহ্মী (Late Brāhmī)

উত্তরকালীন ব্রাহ্মী লিপি গুপ্ত যুগের শুরু অর্থাৎ খ্রি. ৪র্থ শতাব্দী থেকে বিবর্তিত হতে থাকে। গুপ্ত সাম্রাজ্যে পূর্ব যুগের তুলনায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় ছিল বলে নানা উদ্দেশ্যে বহু দলিল রচিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত দলিলের লিপি সব ক্ষেত্রে একই রকম নয়। অঞ্চল ভেদে এদের মধ্যে নানা রকম শৈলী দেখা যায়। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনের নানা কারণ দেখানো থাকে,

Scanned with CamScanner

যেমন – লিপিকারের নিজস্ব লেখন শৈলী, টানা হাতে লেখা লিপির প্রভাব, অলঙ্করণ প্রবণতা ইত্যাদি। Dani-র মতে দ্রুত হাতে লেখার সময় টানা অক্ষর লেখার প্রবণতা, অলঙ্কৃত শৈলী, সামঞ্জস্য ও সমানুপাতের প্রতি আকর্ষণ – এই সব কারণে কোনো লিপির বিশদীকরণ ঘটে এবং অলঙ্কৃত বাঁক, ত্রিভুজ, সামন্তরিক ইত্যাদির যোগ হয় ও নানারকম শৈলীর সৃষ্টি হয়। Upasak এর মতে কুষাণ যুগের চওড়া চৌকো অক্ষর গুপ্ত যুগের লিপিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। অক্ষরগুলির শীর্ষে ঘনত্ব হল গুপ্ত অভিলেখ সমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতের উত্তরাংশে ব্রাহ্মী লিপি গুপ্ত যুগেও কুষাণ লিপির সঙ্গে লক্ষণীয় সাদৃশ্য বজায় রেখেছে (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার মথুরা স্তম্ভলেখ একটি ভালো দৃষ্টান্ত)। মনে রাখতে হবে, উত্তর ভারতে কুষাণদের পর গুপ্তরা ক্ষমতায় আসেন।

গুপ্তযুগের প্রথম দিকে এই লিপির বৈশিষ্ট্য হল বক্রত্ব ও কৌণিকত্ব। এই সময়ে যে সব অক্ষর বিবর্তিত হচ্ছে, কৌণিক থেকে টানা লেখার ধরনে তাদের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে অক্ষরের নতুন নতুন আকৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। অক্ষরের মাথায় 'মাত্রা' দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায় :-

- অ, আ, গ, ড, ত, ভ, শ – এই সব বর্ণের ডানদিকের লম্ব রেখার নিম্নভাগ দীর্ঘ ভাবে নেমে গেছে এবং ক ও র এর ক্ষেত্রে ঐ অংশ এত বেশী দীর্ঘ যে এই সব বর্ণের লম্বরেখাকে বাদ দিলে যা দৈর্ঘ্য হয়, লম্বরেখাযুক্ত দৈর্ঘ্য তার প্রায় দ্বিগুণ। প্রাচীনতম অভিলেখগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বেশী লক্ষণীয়। তাম্রশাসনে এই লম্ব রেখা অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব।

- ঘ, প, ফ– এই বর্ণগুলিতে ডানদিকের অংশে সূক্ষ্মকোণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে পরে এই সব অক্ষরের ডানদিকে লেজুড় বা লম্ব রেখা জন্ম নিচ্ছে।

- খ্রি. ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অ এর বাঁদিকের নীচের অংশে উন্মুক্ত বক্ররেখা দেখা যাচ্ছে, এবং এই ব্যাপারটি এই অক্ষরের পরবর্তী সমস্ত রূপগুলিতেই লক্ষণীয়। আএর ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বর সূচক চিহ্নটি তার ডানদিকে লম্বরেখার পদমূলে সংযুক্ত।

- কুষাণ যুগে প্রচলিত ই-কারের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কালে সমধিক প্রচলিত ই-কারও এই সময় পাওয়া যাচ্ছে। এর উপরদিকে দুটি ও নীচের দিকে একটি বিন্দু (অতএব এর চিহ্ন) এবং কখনো উপরে একটি অনুভূমিক রেখা ও নীচে দুটি বিন্দু। এই অক্ষরের আবির্ভাবের কারণ রূপে মাথার কাছে সমতল অক্ষরের প্রতি পক্ষপাতের কথা বলা যায়। এই অক্ষর থেকেই পরে দক্ষিণী ও নাগরী ইকার জন্ম নেয়।

Scanned with CamScanner

- উ, ঊ, ও - এই সব অক্ষরের বাঁদিকে যেসব অবর্ধিত বা লুপ্তপ্রায় বক্ররেখা ছিল, সেগুলি খ্রি. ৫ম শতাব্দীতেই অনেক স্পষ্ট ভাবে সম্প্রসারিত।

- তালব্য বর্ণ ঞ কে প্রায়ই টানা হাতে লেখা হচ্ছে, গোল করে লেখা হচ্ছে এবং মাঝে মাঝেই জায়গা বাঁচাবার জন্য পাশের দিকে শুইয়ে লেখা হচ্ছে। তবে পুরাতন কোণযুক্ত রূপও বিরল নয়।

- ট অক্ষরটিকে প্রায়ই মাথার কাছে সমতল করে লেখা হচ্ছে।

- ণ এর ডানদিকের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র টান দেখা যাচ্ছে। মনে হয় ডানদিকের হুকের মত অংশের ত্রুটিপূর্ণ গড়নই এর জন্য দায়ী। আবার বাঁদিকে একটি টানা হাতে লেখার ফলে সৃষ্ট ফাঁসও দৃশ্যমান।এই রূপটিতে অক্ষরটিকে শুইয়ে লেখা হচ্ছে এবং এর সঙ্গে নাগরী ণ এর কিছু মিল আছে।

- থ অক্ষরটি বেশীর ভাগ সময়ই উপবৃত্তাকার অথবা ডানদিকে চ্যাপটা এবং প্রায়ই মাঝের বিন্দুটির জায়গায় একটি আড়াআড়ি রেখা টানা হচ্ছে। তবে প্রাচীন রূপটিও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি।

- ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত স্বরচিহ্নগুলির সঙ্গে কুষাণযুগের অভিলেখে প্রাপ্ত ঐ রূপগুলির সাদৃশ্য দেখা যায়। অবে টা এবং ণা– এই দুটি ক্ষেত্রে যুক্ত আ-কার নতুন সৃষ্টি। আবার ইকারকে কখনো কখনো প্রাচীনতর অভিলেখের ইকারের তুলনায় বেশী বাঁদিকে টেনে লেখা হয়েছে। কোন অভিলেখে ঈকার শুধু ডানদিকে টেনে দেওয়া একটি বক্ররেখা। তবে দুটি শৃঙ্গযুক্ত এবং ফাঁসযুক্ত (যেমন ভী) রূপই বেশী দেখা যায়। উকার লেখার সময় প্রচলিত বক্ররেখার সাহায্যেই নেওয়া হয়েছে। রু লেখার জন্য উকারটি র-এর প্রান্তে দেখা যায়। কিন্তু গু, তু, ভু, শু এই রূপগুলিতে উকারটি উপর দিকে উঠে গিয়েছে। ঊকারে ক্ষেত্রে গূ এই প্রাচীন রূপ ছাড়াও অন্যান্য রূপও দেখাযায়। ভূ, টূ তাছাড়া ধূ এরক্ষেত্রে পরবর্তী খুব প্রচলিত এক টানা হাতে লেখা রূপও দেখা যায়। ঐকার এবং ওকারের একটি মাত্রা প্রায়ই উল্লম্বভাবে দেওয়া হয়।

- জায়গা বাঁচানোর জন্য সংযুক্ত বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ রূপে যে ঞ, ট, থ রয়েছে, তাদের টানা হাতে লেখা রূপগুলিকে পাশের দিকে শুইয়ে লেখা হয়েছে।

- ৫ম শতাব্দী থেকে ক্ষুদ্র একটি অন্তিম চিহ্নের উপরে অনুভূমিক রেখা হিসাবে স্থাপিত বিরাম চিহ্নকে প্রথম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তরভারতীয় জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় খ্রি. ৪র্থ শতাব্দীতেই আবির্ভূত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

প্রথমদিকের লিপিতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন গুপ্তসম্রাটদের এবং তাঁদের সমসাময়িক অভিলেখসমূহে ব্যবহৃত বর্ণমালায় আঞ্চলিক বিভেদের কথা বলেছেন। বিভিন্ন বর্ণের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাওয়া যায় তাদের ভিত্তিতেই এই ধরনের বিভেদের কথা তাঁরা অনুমান করেন। ১৮৫৫ সালেই গুপ্তকালীন লিপিমালায় প্রাপ্ত অক্ষরগুলির প্রকারভেদের দিকে E. Thomas পণ্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি ণ, ম, হ, স – এই বর্ণগুলির সূচক চিহ্নসমূহের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। মূলত এলাহাবাদ ও ভিটারি অভিলেখ থেকে দৃষ্টান্তগুলি আহৃত। এইভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে গুপ্ত লিপির যে শ্রেণীবিভাগ হয়, তার সূত্রপাত হয়েছিল। ১৮৮৩ সালে Burgessও এর মধ্যে কোন কোন বর্ণের পার্থক্যের দিকে আলোকপাত করেন। ১৮৮৮ সালে Fleet উত্তর ও দক্ষিণ শ্রেণীর বর্ণমালার বিভেদকে বর্ণরূপে "ম"-কে উল্লেখ করেন। পরে ১৮৯১-৯২ সালে Hoernle বাওয়ার পাণ্ডুলিপিগুলির কাল নির্ধারণের প্রসঙ্গে গুপ্ত লিপির পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় শ্রেণীভেদের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। Fleet এর ইঙ্গিত অনুসরণ করে Hoernleও "ম" অক্ষরটিকেই গুপ্ত পর্বে উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় বর্ণমালার বিভেদকে বর্ণ বলে স্বীকার করেন। উত্তর ও দক্ষিণের এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে একটি ভৌগোলিক বিভাজন রেখাও তিনি অঙ্কন করেছেন। এই রেখাটি মোটামুটি ২৪ থেকে ২২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে পড়ে। Hoernle এই উত্তরভারতীয় শ্রেণীর বর্ণমালাকে আবার প্রধান বিভেদকে বর্ণ 'ষ' এর ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। অবশ্য এই দুই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত অক্ষরগুলির অঞ্চলসমূহের মধ্যে কখনো কখনো পারস্পরিক অধিক্রমণ (overlapping) ঘটে।

Bühler তথাকথিত গুপ্ত বর্ণমালার পূর্ব ও পশ্চিম শ্রেণীর প্রধান বিভাজক বর্ণরূপে ল, হ, ষ-কে চিহ্নিত করেন। পূর্বাঞ্চলীয় ল এর বাঁদিকের অংশটি তীক্ষ্ণ মোচড় দিয়ে নীচের দিকে ঘুরে গেছে। ষ-এর তলার টানটি গোলমত হয়ে গেছে ও মাঝখানের হেলানো রেখাটির সঙ্গে ফাঁস হিসেবে সংলগ্ন হয়েছে। হ এর তলদেশের টানটি অদৃশ্যপ্রায় এবং লম্বরেখার সঙ্গে যুক্ত বাঁকানো হুকের মত অংশটি বাঁদিকে তীক্ষ্ণ মোচড় দিয়ে ঘুরে গেছে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলীয় শ্রেণীতে এই তিনটি বর্ণের পুরাতন রূপগুলি বজায় আছে । সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ অভিলেখে এই বিভেদক বর্ণগুলির পূর্বভারতীয় রূপ দেখা যায়। এই অভিলেখের কাল ৩৭০-৩৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে (অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে)। এ প্রসঙ্গে ৪৬০ খ্রি.

Scanned with CamScanner

...উল্লেখযোগ্য।

- পশ্চিমাঞ্চলীয় গুপ্তবর্ণগুলির আবার দুরকম ভাগ দেখা যায় – (১) টানা হাতে লেখা গোল ধাঁচের অক্ষর (২) কৌণিক ও বৃহৎ অক্ষর। দ্বিতীয় প্রকার বর্ণগুলিতে আবার খুব মোটা মাত্রা রেখা ও হুকযুক্ত 'র' দেখা যায়। এই শ্রেণীর বর্ণ ৪১৫ খ্রি. বিলসড প্রশস্তিতে লক্ষণীয়।

উপরে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগটি অবশ্য ত্রুটিমুক্ত নয়। এর কয়েকটি ত্রুটি এইরকম –

পূর্বাঞ্চলীয় গুপ্ত বর্ণমালার তথাকথিত বিভেদক বর্ণসমূহের রূপগুলিকে প্রাক্ গুপ্ত যুগে উৎপন্ন বলেও দেখানো যায়।পূর্বাঞ্চলীয় শ্রেণীর তথাকথিত বিভেদক বর্ণগুলিকে অনেক সময়ই পশ্চিম ভারতে দেখা যায় এবং এর বিপরীতটিও সমানভাবে সত্য। A.H. Dani লিপিতত্ত্বের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করেছেন। তিনি লিখনশৈলীর সমগ্রতার দিকেই জোর দিয়েছেন। মুষ্টিমেয় বিভেদক বর্ণের দিকে নয়। তাঁর মতে পূর্বাঞ্চলীয়-পশ্চিমাঞ্চলীয় এইরকম শ্রেণীবিভাগ অর্থহীন। এর পরিবর্তে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে লিপির বিবর্তনের দিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছেন, যেমন – মথুরা, কৌশাম্বী, মধ্যগঙ্গা উপত্যকা ইত্যাদি।

খ্রিস্টিয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে মধ্য ভারতে চৌকো মাথা যুক্ত লিপি (box-headed script) দেখা যায়। উত্তর ভারতীয় কিছু গুপ্ত অভিলেখে এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। তবে পুরোপুরি চারকোনা, কৌণিক অক্ষর প্রথম বাকাটকদের অভিলেখে চোখে পড়ে। সপ্তম শতক অবধি মধ্য ভারতে এই ধরনের লিপি ব্যবহৃত হত এবং পরে তা দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে; কদম্ব ও পল্লবদের অভিলেখে এই লিপির ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য গোলাকৃতি অক্ষর ও ঢেউ খেলানো রেখা যুক্ত অক্ষরের প্রচলনই বেশি। এমনকি আধুনিক সময় পর্যন্তও দক্ষিণ ভারতীয় লিপিগুলি তাদের এই বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে।

সিদ্ধমাতৃকা লিপি

খ্রিঃ ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্ব নাগাদ উত্তরকালীন ব্রাহ্মী বা "তথাকথিত গুপ্ত লিপি" একটি বিশিষ্টরূপে বিবর্তিত হয়, যেটিকে সাধারণত সিদ্ধমাতৃকা নামে নির্দেশ করা হয়। একে অন্যান্য নানা নামেও উল্লেখ করা হয়েছে যেমন – acute angled বা সূক্ষ্মকোণী লিপি, আদি (early) নাগরী, কুটিল, বিকট। শেষের নামদুটি বিভিন্ন অভিলেখে বর্ণাত্মক শব্দের ভ্রান্ত ব্যাখার কারণে উৎপন্ন। সিদ্ধমাতৃকা

Scanned with CamScanner

নামটি অল্-বিরুণীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে এই লিপির "সিদ্ধম্" নামটি দ্বারা অল্-বিরুণীর এই বিবৃতি সমর্থিত হয়। যে সব প্রাগাধুনিক লিপির প্রচলিত নাম জানা যায়, সেই অল্পসংখ্যক লিপির মধ্যে এটি একটি। উত্তরভারতীয় লিপিগুলির পরবর্তীকালীন বিকাশের ক্ষেত্রে এই লিপির প্রভাব অতি গভীর। এই লিপির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় ৫৮৮-৮৯ খ্রিঃ এর মহানামনের বোধগয়া অভিলেখ ও লকৃখা মন্ডল প্রশস্তিতে। এই লিপি দশম শতক পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে ও ক্রমে পরিবর্তিত হতে হতে এই কালপরিসরের শেষ দিকে দেবনাগরীতে পরিণত হয়েছে। এই লিপি যে কেবল উত্তর ও পূর্ব ভারতে লক্ষিত হয় তা নয়। পশ্চিমভারতেও এর প্রচলন দেখা যায়, যেখানে তৎকাল পর্যন্ত প্রধানভাবে প্রচলিত দক্ষিণী-শৈলীর লিপিকে এটি উৎখাত করে। কখনো এটি দক্ষিণভারত ও সুদূর দক্ষিণেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পট্টডকল দ্বৈ-লিপীয় অভিলেখে এর নিদর্শন আছে। এই অর্থে এটি এর আত্মজা লিপি দেবনাগরীর প্রাক্-ভূমিকা পালন করেছে। অংশতঃ সর্বভারতীয় জাতীয় একটি লিপির মত এর ভূমিকা ছিল। অনেক সময় সংস্কৃত ভাষা লেখার জন্য স্থানীয় লিপির চেয়ে এটিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধমাতৃকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর প্রবল কৌণিক আকৃতি। এতে তীক্ষ্ণ কোণের মত একটি আকৃতি অক্ষরের নিচের ডানদিকের কোণে দেখা যায়। কালি-কলমে লেখা শৈলী অভিলেখের লিখন শৈলীকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা বোঝা যায়। শীর্ষমাত্রাগুলির বিস্তার কীলকাকৃতি বা ত্রিভুজাকৃতি রূপে হয়েছে। এই কারণে একে অনেক সময় nail-headed বলা হয়। অলঙ্কৃত বিস্তার প্রবণতা বিশেষত স্বরসংযোগ ও সংযুক্ত বর্ণের অধোভাগের ব্যঞ্জনের রূপায়ণে লক্ষিত। কোনো কোনো স্বরচিহ্ন অত্যন্ত পল্লবিত। বিশেষত ই- ও ঈ কার নীচের দিকে ব্যঞ্জনবর্ণটির প্রায় সমান মাপের বা দীর্ঘতর। বিশেষত উত্তরকালীন স্তরে কোনো কোনো অক্ষরের আকৃতিতে গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল দ্বিধাবিভক্ত য, ফাঁস যুক্ত ক, যেগুলি পরে দেবনাগরী ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় লিপির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

শারদা লিপি

সুদূর উত্তর-পশ্চিমে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতেই প্রাক্ শারদা বা প্রত্ন শারদা লিপির আবির্ভাব হয়। এই বিচ্ছিন্ন লিপিটি উত্তরকালীন শারদা ও উত্তর-পশ্চিমা উপবর্গের অন্যান্য লিপিরও উৎস। কাশ্মীর ও প্রতিবেশী পার্বত্য অঞ্চলে

Scanned with CamScanner

এই লিপির জন্ম। বিশেষ করে মধ্যযুগে পুথি ও অভিলেখ উভয় ক্ষেত্রেই এর বিস্তীর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। আফগানিস্তানে শাহী যুগের (৮ম-৯ম শতক) বেশ কিছু সংস্কৃত অভিলেখ পাওয়া গেছে যা শারদা লিপিতে লেখা। লাঘমানে প্রাপ্ত দুটি অভিলেখ প্রকাশিত হয়েছে, তবে জীর্ণ অবস্থার কারণে তাদের পাঠ নিশ্চিত নয়।

Bühler এর মতে শারদা লিপিকে সহজেই পশ্চিম ভারতীয় গুপ্ত লিপির বংশোদ্ভূত বলে শনাক্ত করা যায়। মনে হয় কাশ্মীরের পণ্ডিতদের ব্যবহৃত শারদা নামটির উৎপত্তি ঐ দেশেই। তাই ঐ নামে পরিচিত লিপিটিও সর্বপ্রথম ঐ দেশেই বিস্তার লাভ করে এমন অসম্ভব নয়। Vogel সাহেব Hoernle ও Bühler এর সঙ্গে একমত যে শারদা হল "পশ্চিম ভারতীয় গুপ্ত লিপির" বংশোদ্ভূত। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আর একটু যোগ করে বলা যায় যে, শারদা গুপ্ত লিপির সাক্ষাৎ বংশধর নয়, গুপ্ত লিপির উত্তরাধিকারী কুটিল বা কৌণিক লিপি (সিদ্ধমাতৃকা) থেকেই এর বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে উত্তর হিমালয় ও সংলগ্ন এলাকার পাঞ্জাবি (গুরুমুখী) লিপি এবং অন্যান্য লিপি এর থেকে উদ্ভূত।

Bühler এর মতে সর্বকালে শারদার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল আড়ষ্ট মোটা মোটা টান যা এই অক্ষরের বিশেষ চেহারার জন্য দায়ী এবং এই কারণে এদের সঙ্গে কুষাণ যুগের অক্ষরের সাদৃশ্য রয়েছে। এই লিপির চিহ্ন গুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যেমন- চতুষ্কোণ চ অক্ষর দেখা যায়, ড অক্ষরটির মাঝখানে সূক্ষ্মকোণের বদলে ফাঁস ও কীলকাকৃতি চিহ্ন দেখা যায়। ধ মাথার কাছে চ্যাপ্টা ও তলার দিকে এতটাই প্রশস্ত যে দেবনাগরী প এর মত দেখায়। শ চতুষ্কোণ আকৃতির এবং নাগরী স এর সঙ্গে হুবহু সাদৃশ্যযুক্ত। পরবর্তী শারদা লিপিতে ঊ, এ, ঐ, জ, ঞ, ভ, র্থ ইতাদি কয়েকটি অক্ষরের অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। কানিংহাম, কীলহর্ন, হর্নলে প্রমুখ পূর্ববর্তী লিপিতাত্ত্বিকগণ শারদালিপির অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্যের উপর যে জোর দিয়েছেন ফোগেল তাঁদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন। ব্যুলার যে শারদা অক্ষরগুলিকে কিম্ভূত বলেছেন সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল শারদার উত্তরকালীন লেখ্যগুলির সম্পর্কেই এই বর্ণনা প্রযোজ্য, প্রাচীনতর অভিলেখের ক্ষেত্রে তা সমভাবে খাটে না।

গৌড়ী লিপি

Bühler এর মতে খ্রি. একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পূর্বভারতের নাগরী অভিলেখ সমূহে এমন কিছু স্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ে যা থেকে পরে আধুনিক

Scanned with CamScanner

বঙ্গ লিপির উদ্ভব হয়েছিল। এই সব পরিবর্তনের সংখ্যা খ্রি. দ্বাদশ শতাব্দীতে এত বৃদ্ধি পায় যে, Bühler এদের Proto-Bengali নাম দিতে দ্বিধা করেননি।

Bühler Proto-Bengali বর্ণমালা সম্বন্ধে যে সময়ে তাঁর গবেষণা লিপিবদ্ধ করেন, তার পরেও বহু সংখ্যক অভিলেখ ও বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অবিষ্কৃত হয় পূর্বভারতে (যার মধ্যে অবিভক্ত বঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের অংশ বিশেষ অন্তর্গত) এগুলির লিপিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে একই লিপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ফলে এই লিপির নাম সম্পর্কে বেশ সংশয় দেখা যায় এবং Proto-Bengali এই নামের জায়গায় Proto-Oriya, Proto-Assamese, গৌড়ীয় ইত্যাদি নামের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। বর্তমানে বহু পণ্ডিত গৌড়ী বা গৌড়ীয় নামটির পক্ষপাতী। খ্রিস্টিয় দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এর প্রচলন ছিল। এর থেকেই পরবর্তীকালে পূর্ব ভারতের আধুনিক লিপিগুলি যেমন- বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী লিপি উদ্ভূত হয়েছে।

গৌড়ী বর্ণমালার সবচেয়ে অদ্ভুত ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যাকে আধুনিক বাংলা বর্ণমালা একেবারেই বর্জন করেছে, তা হল ছোট ছোট ত্রিভুজ যার তলার দিকটা গোলচে হয়ে গেছে এবং হুকের মত চিহ্ন (Bühler এর ভাষায় Nepalese hooks) যেগুলি অনেক বর্ণের মাথার বাঁদিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি তাম্রশাসনে (যেমন লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসনে) একই বর্ণের সঙ্গে কখনো ত্রিভুজ কখনো বা "Nepalese hook" ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রমাণ করে যে ঐ "Nepalese hook" আসলে ত্রিভুজের টানা হাতে লেখা বিকল্প ছাড়া আর কিছু নয়। ত্রিভুজ চিহ্নটি নিজে আবার তলায় অর্ধবৃত্ত যুক্ত একটি ঊর্ধ্বমাত্রার পরিবর্তিত রূপ। উত্তর ও মধ্য ভারতের অলঙ্কারণযুক্ত অভিলেখসমূহে এর দেখা পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা লিপিতে যে সব অস্বাভাবিক একক চিহ্ন গৃহীত হয়নি, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে প্রণিধেয় -

- প্রাচীন ই থেকে টানা হাতে লেখা রূপ হিসেবে উদ্ভূত ই।
- ত্রিভুজাকৃতি উকার, (যেমন কু)– যা তর্পণদীঘি ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য অভিলেখে পাওয়া যাচ্ছে। এটি প্রাচীনতর কীলকাকৃতি উকারেরই বহিঃরেখা বা outline।
- বং এবং কং এর ক্ষেত্রে অনুস্বার স্থাপিত হচ্ছে রেখার ওপরেই এবং তার তলায় একটি বিরাম চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

- ওঁ-এর মধ্যে আমরা আধুনিক অনুনাসিকের প্রাচীনতম রূপটি দেখি। বেশী প্রচলিত বিন্দুর পরিবর্তে এখানে অর্ধচন্দ্রের উপরে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত দেখা যায়। খ্রি. ১২শ শতাব্দীর পূর্বাঞ্চলীয় অভিলেখসমূহে দুটি রূপই প্রায়শঃ দেখা যায়। তবে পশ্চিমে এই অনুনাসিক বিরল এবং শুধু ওঙ্কার ছাড়া অন্যত্র তা দেখাই যায় না।
- বিসর্গের ওপর একটি কীলকাকৃতি চিহ্ন দেখা যায় যা অন্যান্য অলঙ্করণবহুল লিপিতে বিরল নয়। বিসর্গের ক্ষেত্রে টানা হাতে লেখার ফল স্বরূপ পরিবর্তন হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতীয় লিপি

দক্ষিণ ভারতের ওপরের দিকে প্রচলিত ছিল তেলেগু-কন্নড় লিপি, যার বিবর্তনের ধারা পৃথক। গোলাকৃতি ও মুখ-বন্ধ অক্ষর লেখার প্রবণতার জন্য উত্তর ভারতের লিপিগুলির থেকে এর বৈশিষ্ট্য পৃথক। এই লিপির অক্ষরগুলির মধ্যে ক, র - এগুলির মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ। আবার প, দ, থ -এগুলি সুস্পষ্ট খাঁজ যুক্ত। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকে এই লিপি বর্তমানে প্রচলিত কন্নড় ও তেলেগু লিপির রূপ নিতে শুরু করে। এই দুটি লিপির মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। তেলেগু লিপির অক্ষরে শীর্ষ মাত্রায় check mark থাকে আর কন্নড় লিপির অক্ষরের ক্ষেত্রে শীর্ষ মাত্রায় একটি অনুভূমিক রেখা ও ওপরের ডানদিকে hook এর মত চিহ্ন থাকে।

দক্ষিণ ভারতের নীচের অংশে আদিমধ্যযুগে গ্রন্থ, তামিল ও বট্টেরুত্তু নামক তিনটি লিপির প্রচলন ছিল। গ্রন্থ লিপি সংস্কৃত ভাষা লিখতে ও অপর দুটি তামিল ভাষা লিখতে ব্যবহৃত হত। এগুলি সবই ব্রাহ্মী লিপি থেকে বিবর্তিত হয়েছে মনে করা হলেও আভিলেখিক সাক্ষ্যের অভাবে এদের বিবর্তনের ইতিহাস ঠিক পরিষ্কার নয় এবং বিতর্কমূলক। Bühler এর মতে উত্তর ভারতের কোনো লিপি থেকে তামিল লিপি উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। তামিল লিপি গ্রন্থ, ও বট্টেরুত্তু লিপির মতই দক্ষিণ ভারতীয় লিপি থেকে উদ্ভূত। তেলেগু-কন্নড় লিপির সঙ্গে তামিল ও কন্নড় লিপির মিল আছে, তাই তেলেগু-কন্নড় লিপি থেকেই এই দুটি লিপির উদ্ভব হয়েছে এরকমও বলা হয়। Bühler আরো মনে করেন যে বট্টেরুত্তু হল তামিল লিপিরই রূপ। কিন্তু গবেষণার দ্বারা প্রমাণ হয়েছে তামিল-ব্রাহ্মী লিপির উত্তরকালীন রূপের সাথে এর মিল আছে এবং সম্ভবত বট্টেরুত্তু লিপি তামিল-ব্রাহ্মী লিপি থেকেই উদ্ভূত। খ্রিষ্টিয় ১৪শ-১৫শ শতকে বর্তমানে প্রচলিত তামিল লিপি তার রূপ পেতে শুরু করে। বিজয়নগরের রাজাদের অভিলেখে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই সময়েই গ্রন্থ লিপি থেকে মালায়লম লিপি উদ্ভূত হয় এবং ধীরে ধীরে তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে।

Scanned with CamScanner